অহঙ্কার

প্রেমদাস রায়

গ্রন্থতীর্থ

প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা

৬৫/৩এ, কলেজস্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

সেদিন যখন গাড়িটা ছেড়ে দিল, কাকলি তখনো তাকিয়ে আছে যতক্ষণ না আমি জানালা দিয়ে হাতনাড়া বন্ধ করছি। ওকে কথা দিয়েছিলাম, কলকাতায় পৌঁছে তোমাকে প্রথম চিঠি দেব। কী লিখব ভাবতে ভাবতে কেটে গেল সারাটা রাত। লেখা আর তাকে হল না। পরের দিন অনেক কষ্টে তাকে লেখা শেষ করে যখন ভাবছি, না কাজটি ভালোভাবে শেষ করা গেছে ঠিক তখনি বিতান এসে বলল, তোমার সঙ্গে একজন দেখা করতে চায় সুপ্রকাশ।

আমি অবাক হয়ে বললাম, আমার সঙ্গে?

— হ্যাঁ তাইতো বললেন, এখানে কাল সুপ্রকাশ দত্ত নামে একজনের আসার কথা। যদি এসে থাকেন, তাহলে দয়া করে বলবেন একজন তার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

আমি বললাম, নাম বলেছে কিছু?

বিতান বলল, আমি জিজ্ঞাসা করিনি, নীচের বসার ঘরে বসে আছেন উনি। যাও না, দেখা করে এস।

আমি বুঝতে পারছি না এই কলকাতা শহরে কে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। পরিচিত কারোর কথা তো খুব একটা মনে পড়ে না। বিতান এবং আমি একই অফিসে চাকরি করি। থাকি শিয়ালদার একটা মেসে, আরো অনেকের সাথে। কাকলিকে কথা দিয়েছি প্রথম মাসের মাহিনা পেয়ে আলাদা বাড়ি ভাড়া নেওয়ার চেষ্টা করব। ও বলেছে, অত তাড়াহুড়ো করো না। আমি তো পালিয়ে যাচ্ছি না। বলেছিলাম, তুমি হয়তো পালিয়ে যাচ্ছ না, কিন্তু আমার মনটা যে কখন কীভাবে কোথায় পালিয়ে যাবে, তাই আর বেশিদিন এভাবে থাকতে চাই না।

কাকলিকে যেদিন প্রথম ভালো লেগেছিল, সেদিন সবে ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পরতে আরম্ভ করেছে। সেই কত ছোটোবেলা থেকে ওর সাথে আমার সম্পর্ক। ওর সঙ্গে মারামারি করেছি। খেলার জিনিস ভাগ করে নিয়েছি। এক সঙ্গে নদীতে সাঁতার কেটেছি, কখনো অকারণে চুল টেনে শাস্তি দিয়েছি, কিন্তু যাকে বলে আকর্ষণ তা কখনও অনুভব করিনি। কিন্তু সেদিনই প্রথম ওকে দেখে চমকে উঠেছিলাম। হঠাৎ কেমন করে যেন আড়ি দেওয়ার সম্পর্কটার উত্তরণ ঘটল সহমর্মিতায়। বললাম, ইস্ কতবড়ো হয়ে গেছিস তুই, দেখে যেন চেনা যাচ্ছে না।

ও শুধু হাসছে তো হাসছেই। আমি বললাম, এমন হাসছিস কেন?

ও বলল, তোমায় কেমন অবাক করে দিলাম দেখলে তো।

বললাম, শাড়িটা তোকে কে দিয়েছে রে?

ও বলল, তুমি শুধু শাড়ি দেখছ, আমাকে দেখছ না?

আমি বলেছিলাম, তোকে তো রোজই দেখি, নতুন করে তোকে আবার কী দেখব?

ও বলল, কিন্তু যে মেয়েটাকে তুমি রোজ দেখ, সে যখন নতুন বউ হয়ে কারো ঘরে যায়, তাকে তুমি দেখ না নতুনভাবে?

কথাটার মধ্যে সত্য আছে, কিন্তু কাকলি একথা বলছে কেন?

আমি বললাম, হ্যাঁ দেখি তো। তোরও যখন বিয়ে হবে, নিশ্চয়ই তোকেও দেখব নতুন করে।

ও তার কিশোরী চাপল্যে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে সে গুড়ে বালি, বলে পালিয়ে গেল। আমারও ওর কথা খুব একটা মনে হয়নি। পর পর দুদিন ওর সঙ্গে দেখা নেই। নদীর ঘাটে আসে না ও স্নান করতে। স্কুলেও দেখি না কয়েকদিন।

হঠাৎ কী যে হল, ওর জন্য বুকের মধ্যে কোথায় যেন একটা অভাব বোধ হতে লাগল। কিন্তু ওর সঙ্গে আলাদা কোনো সম্পর্ক অনুভব করিনি বলে, কাউকে ওর কথা জিজ্ঞাসা করতে পারিনা। কেটে গেল আরো কয়েকটা দিন, একদিন দেখি ও আমার এক সিনিয়র ক্লাসের ছেলেকে নিয়ে নৌকায় করে কোথায় যেন যাচ্ছে। ওর সঙ্গের ছেলেটিকে আগে কখনও দেখিনি। সঙ্গে কাকলির মাও আছে। আমি চলেছি নদীর পাড় দিয়ে। একবার মনে হল ডাকব নাকি। কিন্তু কী এক শূন্যতায় আমি নীরবে পথ চলতে লাগলাম।

পরের দিন ওর সঙ্গে দেখা হলে বলেছিলাম, কদিন কোথায় ছিলে?

ও শুধু হাসল। আমি বললাম, হাসলে যে?

হাসবনা, একটা শাড়িতে, আমার কী পরিবর্তন দেখেছ, যাকে এতদিন তুই তোকারি করে এসেছ, সে কেমন অবলীলায় তুমিতে উত্তীর্ণ হয়ে গেল। এরপর যখন সত্যি সত্যি আমার বিয়ে হয়ে যাবে তুমি আমায় চিনতেই পারবে না। হয়তো পথেঘাটে ক্বচিৎ দেখা হলে বলবে আপনার সঙ্গে অনেকদিন পর দেখা, বলে লুকিয়ে লুকিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেল।

ও আমার বাল্য ও কৈশোরের খেলার সাথী হলেও, তুই-তোকারির উত্তরে আমাকে কোনোদিন তুই-তোকারি করেনি। কিন্তু সেটা বড়ো কথা নয়। যে কথাটা আমাকে অনেকক্ষণ ধরে ভাবিয়েছে তা হল, ও কী বলতে চায় আমাকে। আমাকে কি ও ঠাট্টা করে গেল?

ছুটির অবকাশে একদিন ওকে একাকী পেয়ে বললাম, কাকলি, শাড়িতে তোমায় ভারি সুন্দর লাগে।

ও অবলীলায় বলল, সিঁথিতে সিঁদুর দিলে আরো ভালো লাগবে। বলে ও প্রায় দৌড়ে চলে গেল।

আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আবার নিজের কাজে চলে গেলাম।

কিন্তু কী যে হয়েছে আমার বুঝতে পারছি না। সবসময়ে ওর কথা মনে পড়ে। পড়তে পড়তে ছাপার অক্ষরগুলো মুহূর্তে মুছে গিয়ে ওর মুখাকৃতি ভেসে ওঠে। খেতে খেতে বার বার হোচট খাই। কী যে করব বুঝতে পারি না।

কেটে যায় বেশ কয়েকটা মাস। আপ্রাণভাবে ভুলে যেতে চেষ্টা করি ওকে। কী হবে, যে আমাকে এড়িয়ে চলে তার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে? তবু মন মানে না।

সেদিন ওদের বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম এক বন্ধুর বাড়ি। হঠাৎ দেখা হয় ওর মায়ের সাথে। প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন আছেন?

উনি বললেন, ভালো, কিন্তু তুমি আস না কেন আমাদের বাড়িতে, আগে তো প্রায় রোজই আসতে। আজকাল একদমই আস না। কাকলির সঙ্গে ঝগড়া করেছ নাকি!

প্রশ্নটা নিরীহ। কারণ যখন ও ছিল আমার খেলার সাথী তখন এরকম ঝগড়া মাঝে মাঝে যে করতাম না তা নয়। দু-একদিন হয়তো রাগ করে যেতাম না। তারপর ওই একদিন আমাদের বাড়িতে এসে বলত, মা তোমাকে যেতে বলেছে। পরে অবশ্য বুঝতে পারতাম মা নয়, আসলে তার রাগ পড়েছে, তাই মিথ্যা অজুহাতে রাগ ভাঙানোর চেষ্টা। সেকথা মনে হতেই বললাম, না মাসিমা, আসলে পড়াশুনার চাপ আছে তো। আর ও-ওতো যায় না।

বিনতা দেবী (কাকলির মা) বললেন, ওতো বাড়িতেই আছে, এস না।

বললাম, এখন একটু কাজ আছে মাসিমা। আমি ফেরার পথে আসব। ওকে বলবেন।

উনি বললেন, আচ্ছা।

বন্ধু ত্রিদিবের ওখান থেকে আমি যখন ফিরছি, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। অন্ধকার নেমে এসেছে। একবার ভেবেছিলাম যাব না। কিন্তু পরমুহূর্তে মনে পড়ে গেল, আমি তো বিনতা দেবীকে কথা দিয়েছিলাম। এখন যদি না যাই, তাহলে আমাকে অহঙ্কারী ভাবতে পারেন; তাই বাড়িতে ঢুকে ডাকলাম, মাসিমা!

উনি তখন ঠাকুরঘর থেকে বেরোননি। কাকলির জ্যাঠাইমা বেরিয়ে এলেন, বললেন, কে?

আমি বললাম, আমি সুপ্রকাশ।

— ওঃ তা এই রাতে তুমি কোথা থেকে আসছ?

বললাম, বন্ধুর ওখানে গিয়েছিলাম। মাসিমাকে কথা দিয়েছিলাম যে, ফেরার পথে আসব। তা মাসিমা কোথায়?

কাকলি বেরিয়ে এসে বলল, তুমি এস। মা বলেছিলেন যে, তুমি আসতে পার। আমি ওর সঙ্গে ভেতরে এলাম।

ওর জ্যাঠাইমার অসন্তোষ লক্ষ করেছিলাম। কিন্তু তাকে খুব একটা গুরুত্ব না দিয়ে ওর সঙ্গে ভিতরের ঘরে গিয়ে বসলাম।

বিতান আবার তাড়া দিল, কী এত ভাবছ বলত? ভদ্রলোক কখন থেকে বসে আছেন।

বললাম এই, যাই।

বাইরের বসার ঘরে এসে দেখলাম এক ভদ্রলোক বসে আছেন। তিনি আমাকে চেনেন না, আমিও তাকে চিনি না। কীভাবে কাকে কী জিজ্ঞাসা করব বুঝতে না পেরে বললাম, আমি সুপ্রকাশ, আপনি আমায় খুঁজছিলেন?

উনি বললেন, হ্যাঁ বাবা, আমি তোমায় খুঁজছিলাম।

— কিন্তু আপনাকে আমি চিনি বলে তো মনে হচ্ছে না।

— না বাবা, তুমি আমায় চিনতে পারবে না। আমি কাকলির মেশোমশাই হই। ওর একটা চিঠি পেয়েছি পরশুদিন। লিখছে তোমার যেন একটু খোঁজখবর নিই। তাই আর কি! তা বাবা তোমার এখানে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো?

— সবে তো কাল এসেছি, আপাতত কোনো অসুবিধা নেই।

উনি বললেন, আমি বাঘাযতীন থাকি।

বলে উনি ওঁর ঠিকানা দিয়ে বললেন, কোনো অসুবিধা হলে আমার বাড়িতে চলে এস। তোমরা এলে তোমার মাসিমার ভালো লাগবে। তা কাকলি কেমন আছে? ও এবার কোন ক্লাসে পড়ছে?

বললাম, বি. এ. পড়ছে। হাঁ ভালো আছে। তারপর ওনাকে প্রণাম করলে উনি আশীর্বাদ করে বললেন, দীর্ঘজীবী হও বাবা। তাহলে আমি উঠি আজ।

বললাম, একটু চা খাবেন মেশোমশাই?

— না না, ওই অভ্যেসটা করা হয়নি। তবে তোমার মাসিমা চা খান।

আমার আর বিশেষ কিছু বলার ছিল না। ওঁরও বোধ হয় আর বিশেষ কিছু জানার ছিল না। আরো দু-একটা কথা বলে উনি চলে গেলেন।

আমি পিকনিক গার্ডেনের একটা ব্যাঙ্কে কাজ করি। জনসাধারণকে নিয়ে ব্যাঙ্কের কাজ। কাউন্টারে বিচিত্র লোকের আনাগোনা। তাদের কাউকে মনে থাকে, কাউকে থাকে না।

একটি কিশোরী মেয়ে প্রায় আসে আমার সেভিংস ব্যাঙ্ক কাউন্টারে। ছোটো ব্যাঙ্ক, একই কাউন্টারে তাই টাকা জমা নেওয়া যেমন হয় তেমনি টাকা যারা তোলে তাদের কাজও হয়। ও আমাকে প্রায়ই বলে, কাকু আমার টাকাটা আগে জমা নাও। আবার কখনও বা বলে, আমারটা আগে দিয়ে দাও। এই সূত্র ধরে ওর সঙ্গে আমার একটা স্নেহের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। একদিন ও বলল, কাকু চল না আমাদের বাড়িতে।

বললাম, যাব একদিন। কিন্তু যাওয়া আর হয় না। একদিন ওকে কথা দিতে হল আগামীদিন যাব। ওদিন ওর জন্মদিন। বললাম, তোমার যখন জন্মদিন নিশ্চয় যাব।

ফেরার পথে মনে মনে ভাবলাম কী দেওয়া যায় ওকে। হাজার হোক কাকু বলে ডাকে।

বাড়িতে গিয়ে চিঠি পেলাম কাকলির! লিখেছে, সুপ্রকাশ, তোমার পর পর তিনটি চিঠি পেয়েছি। কিন্তু সবকটি নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে, বুঝতে পারছি চিঠিগুলো ঠিকমতো আমার হাতে পৌঁছচ্ছে না। জানি তুমি রাগ করছ আমার উত্তর না দেওয়ার জন্য। একদিন বলেছিলাম এত তাড়া কেন, আমি তো পালিয়ে যাচ্ছি না। আজ বলছি, একটু তাড়াতাড়ি কর। এরা বোধহয় চায় না আমাদের ইচ্ছে পূর্ণ হোক। —কাকলি।

ও তাড়া না দিলেও ঘর যে খুঁজিনি তা নয় কিন্তু যে ভাড়া চায় তা দিয়ে আমার পক্ষে ঘরভাড়া নেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি ঘর আমাকে একটা খুঁজে পেতেই হবে। বিতানকে বললাম, দেখ তো বিতান একটা ঘর ভাড়া পাওয়া যায় কিনা।

ও বলল, তোমার এখানে কোনো অসুবিধা হচ্ছে?

— না।

— তাহলে?

— আমার কিছু বার্ডেন আছে। মেসে তো আর তাদের নিয়ে আসা যায় না।

ও বলল, ঠিক আছে, আমি দেখব।

তখন বিভিন্ন বাড়িতে লেখা থাকত ঘরভাড়া দেওয়া হবে। এইরকম কয়েকটা বাড়িতে ঢুকে আমার অভিজ্ঞতা একেবারে তিক্ত হয়ে গেছে। এদিকে কাকলির চিঠির একটা উত্তর দেওয়া দরকার। কিন্তু ভয়, তার হাতে পৌঁছবে কিনা। ওর কলেজের ঠিকানায় চিঠিতে লিখলাম, কাকলি, মানুষের প্রতি আমাদের বিশ্বাসগুলো মরে গেছে। তবু চেষ্টা করব, তাকে বাঁচিয়ে রাখার। তুমি ভেব না। আমরা যা চাই, আমাদের জীবনে তা ঘটবেই এই আশা নিয়ে শেষ করছি। পুনশ্চ দিয়ে লিখলাম, একটি কিশোরী মেয়ে, হয়তো বা সেভেন-এইটে পড়ে, রোজ আসে আমার কাউন্টারে। ডাকে আমাকে কাকু বলে, কাল তার জন্মদিন, বল তো কী দেওয়া যায়? — সুপ্রকাশ।

এ চিঠি তার হাতে পৌঁছলেও উত্তর দেওয়ার আগেই তার জন্মদিন শেষ হয়ে যাবে। তবু তাকে লিখলাম। কেন লিখলাম কে জানে? একটা ফুলের তোড়া এবং বড়ো চকোলেট কিনলাম ওর জন্মদিন উপলক্ষে। আমাদের ব্যাঙ্ক যে রাস্তায়, তারই অপোজিটে দু-তিনটি বাড়ি রেখে তাদের বাড়ি। কিশোরীর প্রায়ই আসা সত্ত্বেও তার নাম জানা হয়নি। বলেছিলাম,

টিফিনের সময় এস, তোমার সঙ্গে যাব। কিন্তু ও এল না। এর মাঝে টিফিন টাইম উত্তীর্ণ হয়ে গেল। মনের মধ্যে কাঁটার খোঁচার মতো খচখচ করতে লাগল। কেন এল না ও। তবে কি বাড়িতে আমাকে যেতে বলার জন্য কোনো অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়েছে ও! বুঝতে পারছি না।

অফিসের স্বাভাবিক কাজে কেমন যেন ভুল হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। ব্রাঞ্চ ম্যানেজার বললেন, কী হল মিঃ দত্ত? আজ যেন কাজে মন নেই।

বুঝতে পারছি, আমার আচরণ সহকর্মীদের দৃষ্টি এড়ায়নি। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিলাম, নাইবা এল ও। নাইবা জানলাম ওর নাম; খুকুমণি, মামণি, সোনামণি, যে কোনো নামেই তো ওকে ডাকা যেতে পারে। আমাকে যখন কাকু বলে ডাকে, তখন তো কোনো অসুবিধাই নেই। অসুবিধা একটাই — হয়তো জন্মদিনের কোনো উৎসব ওদের বাড়িতে পালিত হতে না পারে। তাতে করে একটি অস্বস্তিকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে হয়তো।

ভাবছি অফিস ছুটি হলে যাব ওদের ওখানে। ওর বাবার নাম নীলেশ চক্রবর্তী, বাড়ির নাম্বার ৫/২। কোনো অসুবিধা হবে না।

পাঁচটা বাজতে কয়েক মিনিট বাকি। অফিসের কলাপসিব্‌ল গেটের দারোয়ানকে বলে একটি মেয়ে অফিসে ঢুকল। আস্তে আস্তে চলে এল আমার কাউন্টারে। ক্বচিৎ দু-একবার হয়তো এসেছে মেয়েটি। চেনা চেনা মনে হলেও, স্মরণ করতে পারছি না কোথায় দেখেছি ওকে। আমার কাউন্টারে এসে দাঁড়াতেই, সহকর্মীরা আমার দিকে কেমন যেন রহস্যের দৃষ্টিতে তাকাল। মনে হচ্ছে যে ওরা যেন বলতে চায় ডুবে ডুবে জল খাচ্ছে না তো সুপ্রকাশ! রঞ্জনবাবু আমার পাশের কাউন্টারে কাজ করে। বিতানও এই অফিসে কাজ করে, ও বসে দোতালায়। কিন্তু ওদের কৌতূহলকে কোনো রকম পাত্তা না দিয়ে আমি কাউন্টারে এগিয়ে এলাম। মেয়েটিকে দেখে খুব বয়স্ক বলে মনে না হওয়ার জন্য আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কাউকে খুঁজছ?

আমার তুমি সম্বোধনে ও রেগে গেল কিনা কে জানে। একটু শুধু হাসল, তারপর বলল, আপনি সুপ্রকাশ দত্ত?

— হ্যাঁ। কিন্তু কেন বলতো?

— আমি তনিমা। আমার বোন আনিশা আপনাকে আজ বলেছিল ওর জন্মদিন। আপনি বলেছিলেন, আপনি যাবেন।

আমি বললাম, হ্যাঁ বলেছিলাম, কিন্তু ও বলেছিল আমাকে নিয়ে যাবে দুপুরে।

আবার সেই কৌতূহলী হাসি। আপনি বোধহয় একা একা যেতে পারেন না তাই না?

কথাটির মধ্যে যে গূঢ় অর্থ আছে, তাতে তাকে খুব ছোট্ট মেয়ে বলে মনে হল না।

বললাম, তুমি হয়তো ঠিক বলেছ, আবার হয়তো ঠিক বলনি। আসলে আনিশা বলেছিল, আমি টিফিনের সময় তোমায় নিয়ে যাব কাকু। তুমি কিন্তু অন্য কোথাও যাবে না। বলেছিলাম, তোমাকে আসতে হবে না। কীভাবে যেতে হবে আমাকে বল, আমি ঠিক চলে যাব। ও ছেলেমানুষের মতো খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, ইস্ তুমি একা একা যাবে? চিনতেই পারবে না। তারপর বলেছিল, না কাকু, আমিই আসব।

এবার তনিমা বলল, নিশ্চয়ই ওর জন্য অপেক্ষা করে ভাবছেন মেয়েটার কী আক্কেল দেখেছ, আসবে বলেও এল না।